# সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাব

সন্তোষ দত্ত



রাজপথ যেমন পথের রাজা, রাজনীতি তেমন নীতির রাজা নয় । রাজনীতি হল রাজ্য শাসন বা রাষ্ট্রচালন নীতি । রাজ্য বা রাষ্ট্রচালনার নীতির উৎস, বিকাশ এবং ভালমন্দ বিচার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়, সাহিত্যের নয় । তবে আমাদের সাহিত্যে সাধারণভাবে রাজনীতির প্রভাব কেমনভাবে পড়েছিল, তার একটি রেখাচিত্র দেওয়া যেতে পারে । তাই আমি এই আলোচনাকে সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করব । বলা বাহুল্য, তা বাংলা সাহিত্যের কথা ।

রায় গুনাকর ভারতচন্দ্রের কাল হল ১৭১২ থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ বৃটিশ পূর্ব যুগ । এই সময়টিকে যদি বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনাপর্ব ধরা হয়, তাহলে দেখা যায়, তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে বর্গীর আক্রমণকে রাজ্য বিপর্যয়ের কাল হিসাবে ধরা হয়েছে । ভারতচন্দ্র প্রায় ৪০ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮৫২-৫৫ হওয়া সম্ভব, সেখানে তিনি নবাব আলিবর্দীর রাজ্যের আপৎকালীন অবস্থার কথা বলেছেন এইভাবে ঃ বর্গী মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি । / আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি ।।/লুটি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল ।/গঙ্গাপার হইল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল ।।/কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি ।/লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী ।।/পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল ।/কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল ।”বর্গীর অত্যাচারে নবাব আলিবর্দীর রাজ্যশাসন ব্যবস্থা যে কিভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল তার কথা আমরা এখানে পাই । পরবর্তীকালে বঙ্গে বর্গী নাটকেও তার বাস্তব চিত্র আছে ।

আলিবর্দীর পর বাংলার সিংহাসনে বসেন তাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজদ্দৌল্লা । পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে । ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে এই যুদ্ধের কথা আছে ঃ বৃটেশের রণবাদ্য বাজিল যেমনি, /কাঁপাইয়া রণস্থল, কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,/কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধবনী ।/নাচিল সৈনিকরক্ত ধমনী ভিতরে,/মাতৃকোলে শিশুগণ করিলেক আস্ফালন,/উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে ।” পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে নবীনচন্দ্র বাঙালী চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে-বাঙালিরা ঃ প্রতিজ্ঞায় কল্পত সাহসে দুর্জয়,/কার্যকালে খোঁজে শুধু নিজ নিজ পথ ।/স্বর্গ-মর্ত্য করে যদি স্থান বিনিময়,/তথাপি বাঙালি নাহি হবে একমত ।”

পলাশীর যুদ্ধের একশ বছর পরে ১৮৫৭ তে হয় সিপাহী যুদ্ধ বা বিদ্রোহ । পরবর্তী সময়ে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সিপাহী বিদ্রোহ কবিতায় তার একটি আবেগময় চিত্র তুলে ধরা হয়েছে । প্রমথনাথ বিশীর বিখ্যাত উপন্যাস লালকেল্লা এবং সিপাহী যুদ্ধকালীন গল্প সংকলন চাঁপাটি ও পদ্ম গ্রন্থে এই যুদ্ধ ও সেই সময়ের রাজনীতির কথা বর্নিত হয়েছে ।

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয় । ইংরেজি ১৮৫৯-৬০ সালে এই বিদ্রোহে বাংলা দেশের নীলচাষীরা নীলকর সাহেবদের বিদ্ধে জীবন পণ করে লড়াই করেন । ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকে তারই বাস্তবায়ন । এই নাটকখানি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসুদন দত্ত বলে ধারণা । আর প্রকাশ করেন লঙ সাহেব । ফলে লঙ সাহেবের জেল ও জরিমানা হয় । জরিমানার একহাজার টাকা দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ । ম

াইকেল মধুসুদন গোপনে ভৎসিত হন । যদিও ইউরোপ থেকে রাসায়নিক নীল বড়ি আমদানী নীলচাষ বন্ধের একটি ক ারণ, তবু এই নীলদর্পণ নাটক বিভিন্ন স্থানে অভিনয়ের ফলে যে নীলচাষের অবলুপ্তি - তা আর একটি কারণ । এইভাবে সেকালের কাব্যে ও নাটকে রাজনীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ।

উপন্যাসে এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ -এ । ইংরেজি ১৮৮২ সালের ১৫ ডিসেম্বর গ্রন্থখা নির প্রথম প্রকাশ । মনে রাখা প্রয়োজন, তখন রাজনীতিক্ষেএে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব হয়নি । ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের সৃষ্টি । তার তিন বছর আগে রচিত এই উপন্যাসে দেশমাতৃকার মুক্তিকামনায় সন্তান দলের ত্যাগব্রত এবং জীবনদানের বর্ণনা আছে । নীলদর্পণ নাটকে ইংরেজ নীলকরদের হাতে যেমন নারীর ঘৃণ্য লাঞ্ছনার দৃশ্য আছে, বিপরীতভ াবে আনন্দমঠে নারীর হাতে ইংরেজ রাজপুষদের লাঞ্ছনার চিএ আমরা দেখতে পাই । নারী সেখানে অসহায় অবলা নয়- শক্তিময়ী । দেশকে মাতৃপে কল্পনা করে বন্দেমাতরম গানে তার প্রশস্তি এবং মহেন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ভবানন্দের সেই উক্তি মনে রাখার মত ঃ

আমরা অন্য মা মানিনা-জননী জন্মভূমিশ্চস্বর্গদপি গরীয়সী । আমরা বলি জন্মভূমিই জননী । আমাদের মা নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুএ নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই । আমাদের আছে কেবল সুজলা সুফলা মলয়জ সমীরণ শীতলা, শস্যশ্য ামলা -জন্মভূমি । তাই বন্দেমাতরম শুধু একটি গ্লাগান নয়-দেশপ্রেমের বাণী-যা স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতিকে প্রেরণা দিয়েছে । যদিও আনন্দমঠ নিয়ে আজও বিতর্কের শেষ নেই, তবু সবার উর্ধে এটি পরাধীনতা ধেকে মুক্তির প্রয়াস জনিত উপন্যাস - একথা অনস্বীকার্য ।

১৮৮২ সালে 'আনন্দমঠ' প্রকাশের তিনবছর পর ১৮৮৫-তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৯৬-এ কলক াতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম' গানের প্রথম সাত পংক্তি গেয়ে শোনান। সেই উপলক্ষ্যে ঠ াকুর বাড়িতে কংগ্রেস সদস্যদের জন্য একটি পার্টি দেওয়া হয়। সেই পার্টিতে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত একটি গানে সকলকে মুগ্ধ করেন। গানটির প্রথম কয়েক পংক্তিঃ " অয়ি নির্মল সূর্যকরোজ্বল ধরণী/জনক জননী জননী।" রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দেলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ৩১ আশ্বিন, অর্থাৎ কার্জন যেদিন খণ্ডিত বঙ্গের আদেশ দেন, সে দিন সকালে ঠাকুর বাড়ি থেকে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে পথ পরিত্রমায় বের হন। কণ্ঠে ছিল স্বরচিত 'বাংলার মাটি বাংলার জল' নামে সেই বিখ্যাত সঙ্গীত।
হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে রাখী বন্ধনের পুনঃপ্রবর্তন করেন তিনি। চিৎপুরের বড় মসজিদে গিয়ে ইমামদেরও রাখী পরিয়েছিলেন। কিন্তু আচর্যের বিষয়, মাত্র তিনমাস আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত এই আন্দোলনে যুক্ত থাকার পর অসংখ্য মানুষকে বিস্মিত করে তিনি পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন। 'খেয়া' কাব্যের 'বিদায়' কবিতায় তার প্রকাশ ঘটল এইভাবে- -'বিদায় দেহো, ক্ষম আমায় ভাই/কাজের পথে আমি তো আর নাই" (১৪ই চৈত্র১৩১২)। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে একখ ানি চিঠিতে লিখলেন --"যাঁরা গভর্ণমেন্টের বিদ্ধে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলে মনে করেন" তিনি তাদের দলে নেই। 'অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হয়ে তিনি তাঁর প্রদীপখানি জ্বেলে পথের ধারে বসে থ াকবেন। 'বিদায়' কবিতায় আরও বললেন - "আমি এখন বনচ্ছায়াতলে অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই।. তোমরা মোরে জাক দিওনা ভাই।'
১৯১৫ সালে রচিত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে কবি সন্দীপ নামে এক রাজনৈতিক নেতার নৈতিক স্খলনের চিত্র আঁকলেন। দেমাতৃকার মুক্তির চেষ্টা অপেক্ষা বন্ধুপত্নীর সঙ্গে প্রেম করা, বিলাস ব্যসন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় যে-নেতা 'বন্দেমাতরমের পরিবর্তে বন্দেমোহিনীম' কথাটিকে মেনে নিয়েছে। আবার ১৯১৯ সালের এপ্রিলে জালিয়ানওয়ালাব াগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ এবং ১৯৩১'র সেপ্টেম্বরে হিজলী জেলে দুই বিপ্লবীর হত্যাক াণ্ডে মর্মাহত কবির প্রতিবাদ জ্ঞাপন কবিচরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য সুপরিলক্ষিত । বঙ্কিম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম উদ্‌গাতা হিসাবে চিহ্নিত আর রবীন্দ্রনাথ উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধী, যে কারণে কবির মনোভাব বিপ্লবীদের মনে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। জাতীয়তাবাদকে বাদ দিয়ে কবির বিশ্বমানবতাবাদ তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

১৯১৪-তে বেজে উঠল প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা। তার এক বছর আগে ১৯১৩-তে 'বড়দিদি' উপন্যাস নিয়ে শরৎচন্দ্রের পাকাপাকিভাবে সাহিত্যে প্রবেশ। দীর্ঘকাল তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, সুতরাং প্রত্যাশিতভাবেই তঁার রচনায় রাজনীতির প্রভাব লক্ষণীয়। প্রাসঙ্গিকভাবেই 'পথের দাবী'র কথা বলা যায়। এই উপন্যাসখানি ১৯২৬-এর অাগস্টে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের নায়ক সব্যসাচী মল্লিক রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপ নয়, বরং আনন্দমঠের জীবানন্দের সঙ্গে তার কিছু কিছু মিল লক্ষ্য করা যায়। এই বইখানি ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ তথা বাজেয়াপ্ত হয়। পরাধীনতার জ্বালা কেমনভাবে জাতির মর্মবেদনার কারণ হতে পারে এবং তা থেকে মুক্তির উপায়ের জন্য জীবনপণ করে বিপ্লবীরা কিভাবে এগিয়ে চলে, তার কাহিনী 'পথের দাবী'। যদিও সাহিত্য বিচারের নিরিখে এর সাফল্য অসাফল্য বড় কথা নয়, তবু রাজনৈতিকভাবে তা জাতিকে প্রেরণা দিয়েছে।
প্থম বিশ্বযুদ্ধের কাল ১৯১৪ থেকে ১৮ । পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাব ক্রমবর্ধমান। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকারের দমন নীতিও বেড়ে গেল। তৎকালীন কবিদের মধ্যে অনেকেই দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন প্রমুখ আছেন । আর রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেনই। আরও ছিলেন চারণকবি মুকুন্দ দাস- যিনি মাতৃপূজা নাটক লিখে ও অভিনয় করে ১৯০৮ সালে দিল্লী জেলে তিন বছর কারাদ্ধ হন এবং তাঁর তিনশ' টাকা জরিমানা হয়। এই প্রসঙ্গে কাজী নজল ইসলামের নাম স্মর্তব্য। ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে 'ধুমকেতু' পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লিখে নভেম্বরে তিনি কারাবরণ করেন। তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতা ও গান বাঙালি জনমানসে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। দুঃখের বিষয়, নজলের এই দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানের মধ্যে মাতৃমূর্তি কল্পনার জন্য তাঁকে তার স্বজাতির অনেক বিদ্রূপ ও অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। মাসিক ইসলাম দর্শন' নামে একটি পত্রিকায় তাঁকে 'যবন হরিদাসের ..... উৎকট অবতার' বলে বিদ্রুপ করা হয়। ঐ পত্রিকাতেই মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মেদ নামে একজন একটি প্রতিবেদন লেখেন । লেখার নাম লোকটা মুসলমান না শয়তান'। সেই রচনায় নজলের 'ধুমকেতু' সম্বন্ধে নানা কটূক্তি করে বলা হয়েছিল-- .... লোকটার বুকের পাটা বেড়ে গিয়েছে। খাঁটি ইসলামী আমলদারী থাকলে এই ফেরাউন বা নমদকে শূলবিদ্ধ করা হত।''

নজলের সাহিত্যে আবির্ভাবের প্রায় সমকালেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়। ইংরেজি ১৮৮৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ১৯০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ, ১৯১০-এ হিন্দু মহাসভা এবং ১৯২০সালের ১৭ই অক্টোবর উজবেকিস্তান -এর তাসকন্দ্‌ শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপন হয়। একদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ,অপরদিকে মার্কস্‌ীয় চিন্তা-চেতনার মধ্যে মুসলিম ও হিন্দু সংগঠন । এর প্রভাব কমবেশি ছিল সমকালীন বাংলা সাহিত্যে। নজলও এর দ্বারা প্রভাবিত হন। প্রথমে মুজফ্‌ফর আহম্‌দের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে মার্কসীয় চিন্তাধারা, পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য এবং শেষে পুত্র বুলবুলের মৃত্যুর পর বরদাচরণ মজুমদারের কাছে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ। তাঁর বিভিন্ন রচনায় এর প্রমাণ সুপরিলক্ষিত।

প্রাসঙ্গিকভাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখযোগ্য। প্রথম জীবনে স্বদেশী আন্দেলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ, পরে কংগ্রেসী রাজনীতি, মধ্যে ফ্যাসিবিরিাধী সাহিত্যিক ও শিল্পী সংঘের সভাপতি থাকাকালীন মন্বন্তর' উপন্যাসে বামপন্থী আদর্শের রূপায়ন, শেষে পথ পরিবর্তনের পর কংগ্রেসী রাজনৈতিক প্রভাব-জনিত উপন্যাসের মধ্যে চৈতালী ঘূর্ণি, মন্বন্তর, পঞ্চগ্রাম, গণদেবতা, উত্তরায়ন এবং ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন রচনা 'একটি কালো মেয়ের কাহিনী

উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্করের নিজের কথায়-- 'সাহিত্য সাধনার প্রারম্ভে একদিন জেলখানা থেকে সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছিল াম যে , বাংলার রাজনৈতিক কর্মজীবনের কথা সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ করব। একজন সাহিত্য -শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করে যতদূর সম্ভব তা তিনি পালন করেছেন।

প্রায় সমসাময়িককালে ইংরেজি ১৯৩৯-এ প্রকাশিত গোপাল হালদারের রাজনৈতিক উপন্যাস 'একদা' এবং ১৯৪২-এর আন্দোলন নিয়ে রচিত সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী উপন্যাস ১৯৪৬-এ প্রকাশিত হয়। মনোজ বসুর 'ভুলি নাই' নামে একটি কবিতায় বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিতর্পণ করেন। তিনটি স্তবকে লেখা এই কবিতার প্রথম স্তবকটি প্রাসঙ্গিকতা বোধে উদ্ধৃত করছিঃ

''যাহারা শোণিত সিক্ত পদচিহ্নে পথ রচি'' বিক্ষুব্ধ ধূলায়
উত্তপ্ত বুকের রক্তে মৃতপ্রায়া জননীর করিল তর্পণ,
মানবের মহালোভ, বাঁচিবার লোভ যারা ত্যজিল হেলায়,
নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা অমারাত্রি সার করি কৈল বিসর্জন।
স্বাধীনতা সঁপি দিতে বহু লক্ষ পরাধীন আশাহীন জন
পথ-কুক্কুরের মত পথে পথে তাড়া খেয়ে ফিরি দীর্ঘদিন
কেহ বা বরিল কারা, কেহ মৃত্যু-- মহোল্লাসে প্রেম আলিঙ্গনে--
স্বেচ্ছাবৃত অপঘাতে জীবনের সর্ব আশা করিল বিলীন।
ক্লেদপঙ্ক-সমাকীর্ণ এ তিমিরে তাহারা আলোক-বার্তাবহ,
তাহারা জানিয়াছিল দিশাহীন অন্তহীন নহে পারবার,
ওরে হতভাগ্য দেশ, তাদের স্মরণ করি মৃত্যুদীক্ষা লহ--
নবাগত হে পথিক, বিগত পথিকদলে কর নমস্কার।''

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি রাজনৈতিক প্রভাব বর্জিত বলে আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু ১৯৫০-এ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে রচিত 'ইছামতী' উপন্যাসে তিতুমীরের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ এবং নীল বিদ্রোহের কিছু চিত্র আছে-- যা বাস্তব। নীলকুঠির বড়সাহেব শিপ্‌টন, ছোটসাহেব ডেভিড, নীলকুঠির দেওয়ান রাজারাম রায় প্রভৃতি চরিত্রগুলি জীবন্ত চরিত্র। এদের অত্যাচারের ফলে প্রজা বিদ্রোহ । সুতরাং কোন শিল্পী তাঁর সমসময়কে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে পারেন না। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় লেখা তাঁর অশনি সংকেত' উপন্যাসখানি অন্যতম দৃষ্টান্ত।

এই সময়ের বৃত্তে আর একজনের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়, তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথনম জীবনে তর্ক করে জেদের বশে যাঁর সাহিত্য চর্চা শু, পরবর্তী সময়ে তিনি সর্বাংশে একজন সাহিত্য শিল্পী । তাঁর প্রথম দিকের দিবারাত্রির কাব্য, জননী, পুতুল নাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি এবং পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক প্রভাব-জনিত উপন্যাস দর্পণ, জীয়ন্ত প্রভৃতির মদ্যে পার্থক্য আছে। এই সময় তিনি মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। পরিণামে প্রথম দিকের রচনার সঙ্গে পরবর্তী রচনার পার্থক্য লক্ষ্য করার মত। লালিত্যহীন ভাষা ওবং অতিবাস্তবতার প্রতি আসক্তিতে তাঁর শেষদিকের রচনাগুলি ক্ষেত্র বিশেষেঅবাস্তব হয়ে উঠেছে। শুধু মাত্র রাজনীতি যখন সাহিত্যের উপজীব্য হয়, তখন সাহিত্য সেখানে গৌণ হয়ে রাজনীতিই মুখ্য হয়ে ওঠে। তখন প্রকৃত সাহিত্যিক তাঁর স্বধর্মচ্যুত হয়ে রাজনৈতিক ভাষ্যকার রূপে আবির্ভূত হন। তখনই ঘটে বিপত্তি। মানিকের অনেক রচনাই এর প্রমাণ। শেষ পর্যন্ত তিনি অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্সে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে মানিকের লিখিত ব্যক্তিগত ডায়েরী থেকে এর প্রমাণ দিয়েছেন আমাদের সাহিত্য প্রেমিক মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর পুড়ে যায় জীবন ন্নর' নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থে।

আরও পরে সমরেশ বসুর নকশালদের নিয়ে লেখা উপন্যাস 'মহাকালের রথের ঘোড়া'। রাজনৈতিক প্রভাব জনিত

উপন্যাসের মধ্যে সমরেশ মজুমদারের উত্তরাধিকার, কালবেলা, কালপুষ এবং মহাশ্বেতা দেবীর ‘বিরসা মুণ্ডার কাহিনী’ উল্লেখযোগ্য।

এঁদের মধ্যে সমরেশ বসু প্রথমে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী হন, পরে সেই পথ থেকে সরে আসেন । কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এমনই একজন। যিনি একসময় লিখেছিলেন-- প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য /ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা’। তিনিই আবার পরে ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত’ বলে অভিভূত হলেন। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, সমরেশ বসু লিখিতভাবে ‘দেশ’ পত্রিকায় এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকায় বামমার্গে অনীহা সম্পর্কে একসময় দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছিলেন।

পরিশেষে বলি, সাহিত্যে রাজনীতির চর্চা নতুন নয়। আমাদের মহাকাব্য মহাভারতে এর দৃষ্টান্ত আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির যখন সবান্ধবে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের কাছে গিয়ে তাঁকে রাজনীতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার জন্য অনুরোধ জানান, তখন ভীষ্ম তাঁকে সেই উপদেশ দেন। বাংলা সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাব সাহিত্যকে শুধু সমৃদ্ধ করেনি, নানা বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছে। সাহিত্যসৃষ্টির উৎস-- মানুষ। সেই মানুষ, সমাজ-বিচ্ছিন্ন নয়। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আজ রাজনীতি সমাজের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। ভাল হোক মন্দ হোক, সেই রাজনীতি মানুষকে কখনো কাছে টেনেছে, কখনও বা ধীরে সরিয়ে দিয়েছে-- কিন্তু তাকে বরাবরের জন্যে ত্যাগ করেনি। সাহিত্য স্রষ্টাগণ এই পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে আপন চি-প্রবৃত্তি ও শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী সাধনা করেছেন এবং সেই মত সিদ্ধিলাভ করেছেন। ফলে কেউ কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন, কেই বা বিন্দুবৎ আপন অস্তিত্ব রক্ষায় যত্নবান হয়েছেন। তবু কম হোক বেশি হোক, তাঁদের সকলের অবদানে বাংলা সাহিত্য ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে উঠেছে।
(৮.৯.০২ তারিখে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজে ‘চিত্রোক্তি’ আয়োজিত সাহিত্য সভায় উপরিউক্ত শিরোনামে বক্তৃতা।)



সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com